কোরআন ও হাদিসের আলোকে
যুব প্রজন্মের সমস্যা ও সমাধান

ইয়ুথ প্রবলেম

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন
অনুবাদ: আলী আহমাদ মাবরুর

ইয়ুথ প্রবলেম

লেখক :
মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন

অনুবাদ :
আলী আহমাদ মাবরুর

বিন্দু প্রকাশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর।

মানুষের জীবনে যৌবনকাল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, যে সময়টিতে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। জীবনের এই সময়ই ভবিষ্যতের আশা, ভরসা ও গতিপথ নির্ধারিত হয়। জাতির ভবিষ্যৎ কান্ডারি আজকের যুবকরাই। সঠিক পরিচর্যা পেলে যৌবনকাল একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন এবং সৃষ্টিশীল সময় হয়ে উঠতে পারে। আবার যৌবনেই একজন ব্যক্তিকে নানা ধরনের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সংকটের ভিতর দিয়ে পার হতে হয়। একজন যুবক মূলত তার জাতি বা সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎকে নিজের কাঁধে বহন করে বেড়ায়। যুবকরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে অর্থাৎ যৌবনকালে যেসব সমস্যা ও সংকট মোকাবেলা করে তা নিয়ে আমাদের সবার ভাবা উচিত এবং এই সংকটগুলোর সমাধান কল্পে সঠিক ও বাস্তব সমাধান খুঁজে বের করা আবশ্যক।

ইসলাম হচ্ছে এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যা মানব জীবনের প্রতিটি সময়, ক্ষেত্রে এবং স্তরে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করার সামর্থ্য রাখে। বর্তমান সমাজে যুব প্রজন্ম ভীষণভাবে উভয় সঙ্কটের মধ্যে ডুবে আছে। তাদের মনে নানা ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং ভুল ধারণা বাসা বেধেছে। ফলে তারা প্রচণ্ড সংশয় এবং সংকটে পতিত হয়েছে। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে তারা সামনের দিনগুলোতে আরও ভুল পথে অগ্রসর হবে এবং পরিণতিতে তারা উচ্ছন্নেও চলে যেতে পারে। অথচ বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি ও প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের হেদায়েতের জন্য পরিপূর্ণ নির্দেশনা পাঠিয়েছেন। সেই নির্দেশনাগুলোকে কেউ যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে এবং অনুসরণ করে তাহলে সবচেয়ে কঠিন এবং বাজে পরিস্থিতিতে থেকেও একজন মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে। যুবকদের মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক জীবনযাপন করে তারা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য স্বস্তি, অনুপ্রেরণা এবং শক্তির উৎসে পরিণত হয়। তারা ভবিষ্যতের জন্য আশার সঞ্চালন করে। শুধু তাই নয়, বিশ্ব বর্তমানে যে অসুস্থতায় এবং অস্থিরতায় প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হচ্ছে তার একটি সমাধান হিসেবেও তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে তাদের পুরস্কার শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে নয় বরং আখিরাতের জন্য ও নিশ্চিত হয়ে যায়।

এই ছোট্ট পরিসরের বইটিতে শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমীন যুব সম্প্রদায়ের বিদ্যমান সংকটগুলোকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সনাক্ত করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে বেশকিছু সুপারিশমালা প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি উন্নত জীবনযাপন করার তৌফিক দিন। -আমিন

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আরও একটি ছোট কাজ করতে সক্ষম হলাম। এই বইটি আকারে ছোট হলেও তাৎপর্যের দিক থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় হলো তার যৌবনকাল। আল্লাহ তায়ালা রোজ হাশরের দিন যৌবনকালে অতিবাহিত সময় নিয়ে মানুষকে প্রশ্ন করবেন। যৌবনকালকে জীবনের সবচেয়ে সক্রিয় সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সময়টিতেই মানুষের মন, মস্তিষ্ক এবং শারীরিক সক্ষমতা সর্বোচ্চ মানে অবস্থান করে।

আর ঠিক এই কারণেই শয়তানও মানুষের যৌবনকালটাকেই টার্গেট করতে পছন্দ করে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও প্ররোচনায় দিকভ্রান্ত হয়ে যুবসমাজ বিপথগামী হয়। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। আর যুব প্রজন্ম যদি পথভ্রষ্ট হয় তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পড়ে যায়। তাই, যুব সম্প্রদায়ের সংকট, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান নিয়ে অনেক বেশি কাজ হওয়া দরকার।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (র) রচিত এই বইটি বিন্দু প্রকাশ প্রকাশনা সংস্থার অনুরোধে আমি অনুবাদ করেছি। প্রথম দফায় বইটি পড়ে অনেকেরই মনে হতে পারে বইটি আরও বড় পরিসরেও করা যেত। আমি নিজেও তার সঙ্গে একমত। তবে বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছে পরিসর বড় না করেও লেখক অত্যন্ত সফলতার সাথে এই বইটিতে যুব সম্প্রদায়কেন্দ্রিক বিদ্যমান ইস্যুগুলোকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি যুবক-যুবতিদের সমসাময়িক সংকট সমাধানের কিছু দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা এই বইটিতে প্রদান করেছেন। আমরা যদি এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে আরও সম্মুখপানে এগিয়ে যাই এবং ইসলামের নির্দেশনাগুলোকে আরও ব্যাপকভাবে জানার ও মানার চেষ্টা করি তাহলে গোটা পরিস্থিতি আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। শায়খ উসাইমীন এই বইটির মাধ্যমে যুবকদের সাথে নিয়ে সম্ভাবনার দিগন্তের ইতিবাচক কিছু সূত্র পাঠকসমাজকে ধরিয়ে দিয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য।

আমি মনে করি ছোট আকারের এই বইটি পকেট বই হিসেবে বহন করা উচিত। যুবক-যুবতিদের নির্বাশেষে এ বইটি পড়তে দেয়া উচিত। সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা সময় ব্যয় করলে এ বইটি পড়া সম্ভব হবে এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট পাঠকের ব্যাপক উন্নতি ও ইতিবাচক জাগরণ করবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই ছোট্ট খেদমতকে কবুল করুন এবং বইটি প্রকাশ ও প্রচারের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন। আমিন।

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। আমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। ভুল করলে আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চাই। কারণ আমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আমরা আল্লাহর কাছে সব ধরনের অনিশ্চয়তা এবং অশ্লীল কাজ থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর কোনো সত্তার ইবাদত করার সুযোগ নেই। আল্লাহর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের ওপর রহম করুন। সেই সাথে তাঁর পরিবার, বংশধর এবং সঙ্গী-সাথীদের ওপরও রহম করুন।

এটি আমার জন্য অত্যন্ত প্রশান্তির বিষয়, সম্মানিত ভাই ও বোনদের সামনে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উপস্থাপন করতে পারছি। এই সংকটগুলো কেবল মুসলমান সমাজের নয়; বরং বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত সংকট। আর প্রতিনিয়ত এই সমস্যাগুলো যুব প্রজন্মকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলছে।

আজকের যুব প্রজন্মের মনে অসংখ্য আদর্শিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, যা জীবন সম্বন্ধে ক্রমশ সংশয়ে ফেলে দিচ্ছে। যুব প্রজন্ম এসব সংশয় থেকে এবং সব ধরনের উদ্বিগ্নতা থেকে বাঁচার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না।

ধর্ম ও নৈতিকতা ছাড়া এই সংশয় থেকে মুক্তি পাওয়ার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। ধর্ম ও নৈতিকতা হলো এমন বিষয়- যা একটি আদর্শ সমাজের মূল উপকরণ এবং এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ নিশ্চিত হয়। বস্তুত, ধর্ম ও নৈতিকতা চর্চার মধ্য দিয়ে উন্নতি ও প্রশান্তি অর্জন করা যায়। সেই সাথে অনিশ্চয়তা ও প্রতিকূলতা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

যারা সমাজে বসবাস করে মূলত তারাই সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণ করে। তাই কোনো সমাজ গঠনে যদি ধর্মকে পাশে রাখা হয়, তাহলে ধর্মই আপন মহিমায় সমাজের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়। আরেকটি

বাস্তবতা হলো, ধার্মিক মানুষেরা যে কোনো শত্রুর মোকাবেলায় ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং দিন শেষে বিজয়ী হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহ নিজেই ধার্মিক সম্প্রদায়কে সাহায্য করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যারা কাফের, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ৭-৮)

সামাজিকভাবে ধর্মের উপযোগিতা তৈরি করার জন্য মুসলমান হিসেবে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা যারা ইসলামের পতাকা বহন করছি, তাদের অবশ্যই সত্য ও সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে যেন আমরা নিজেদের হেফাজত করতে পারি, একইভাবে অন্যদেরও হেদায়েতের নির্দেশনা দিতে পারি। আর তেমনটা করতে পারলে, মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমরা উত্তম পুরস্কার পাব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের নিয়মিতভাবে আল কুরআন এবং রাসূলের ﷺ হাদীস অধ্যয়ন করা উচিত। তাহলে এসব আসমানি নির্দেশনার স্বপক্ষে কথা বলার মতো কিংবা সেই আলোকে কাজ করার মতো যোগ্য হয়ে উঠতে পারব। একইসঙ্গে, আমরা মানুষকে হেদায়েতের পথে ডাকতে পারব এবং বাতিল শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে যত ধরনের পরিকল্পিত অপপ্রচার চালাচ্ছে, সেগুলোও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারব। সর্বোপরি, অন্ধকার হটিয়ে আলোকিত সত্যকে মানুষের সামনে নিয়ে আসতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

এই কাজগুলো করতে হলে, ঈমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠতা, দায়িত্ববোধ ও সুন্নাহ অনুসরণ করার যে গুরুদায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে তা পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। কেবল কথায় আর বক্তব্যে পারদর্শী

হলে চলবে না, কাজেও সক্রিয় হতে হবে। কারণ যদি কথার সাথে কাজে মিল না থাকে তাহলে এর প্রভাব খুব বেশি একটা পরিলক্ষিত হয় না।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُون - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون

"হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা নিজেরাই আমল কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।" (সূরা আস সফ : ২-৩)

ফলে, যদি আমরা সমাজের বিদ্যমান সংকট নিয়ে কাজ করতে চাই, তাহলে উচিত হবে শুরুতেই যুব প্রজন্মের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাদের ভাবনা ও কার্যক্রমগুলো বোঝার চেষ্টা করা।

যারা ইতোমধ্যেই বিপথগামী হয়েছে তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবেই তারা নিজেদের চরিত্র সংশোধন করার সুযোগ পাবে এবং বিদ্যমান ভুলগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবে। মনে রাখতে হবে, আজকের যুবকরাই জাতির ভবিষ্যৎ। মুসলিম উম্মাহ কতটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির উপরে টিকে থাকবে, তা নির্ভর করছে আমরা যুবকদের কতটা দিকনির্দেশনা দিয়ে যেতে পারছি তার ওপর। পাশাপাশি, যুব সম্প্রদায়ের অধ্যয়নের জন্য তাদের সামনে ভালো ভালো গ্রন্থ উপস্থাপন করতে হবে। সেই সাথে সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করতে হবে এবং যা কিছু ভালো ও উত্তম সেদিকেই পরিচালিত করতে হবে। যেহেতু আজকের যুবকদের ওপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তাই যুবকরা যদি সৎ হয় এবং তাদের ভিত্তি ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মভিত্তিক হয়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎও উত্তম হবে ইনশাআল্লাহ।

এক নজরে যুব প্রজন্ম

যুব সম্প্রদায়কে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ধারা হলো ন্যায়নিষ্ঠ ও নীতিবান যুব সমাজ। দ্বিতীয় ধারায় থাকবে, দুর্নীতিগ্রস্ত যুব সমাজ এবং তৃতীয় ধারায় থাকবে, সংশয়ে ডুবে থাকা যুবক-যুবতিরা।

ন্যায়নিষ্ঠ যুব প্রজন্ম

এক কথায় বলতে গেলে, ঈমানদার যুবক-যুবতিরা ন্যায়নিষ্ঠ ও নীতিবান হয়। তারা নিজেদের ধর্মকে শুধু বিশ্বাসই করে না; বরং ভালোবাসে এবং ধর্ম যা নির্দেশনা দিয়েছে, তা অন্তর থেকে ধারণ করে। তারা মনে করে, ধর্ম মেনে চললেই লাভ; অগ্রাহ্য করলে নিশ্চিত ক্ষতি।

এসব যুবক-যুবতিরা আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করে এবং কথা ও কাজে রাসূলের ﷺ সুন্নাত অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল এবং তিনিই একমাত্র নেতা, যাঁকে সত্যিকারার্থে অনুসরণ করা যায়।

এই যুবকরা নিজেদের সামর্থ্যের আলোকে নিয়মিত ফরজ নামাজ আদায় করার চেষ্টা করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে নামাজের মাধ্যমে সাময়িক, অসীম ও জাগতিক বিভিন্ন ধরনের উপকার পাওয়া যায়। আর নামাজকে অবহেলা করলে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নানা ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে।

নীতিবান যুবক ও যুবতিদের মধ্যে যারা সামর্থ্যবান, তারা নিয়মিত যাকাত আদায় করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে, যাকাতের মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম ও মুসলিমদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। আর এ কারণেই যাকাতকে ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এসব যুবক-যুবতিরা রামাদান মাসে রোজা পালন করে। শীতকাল হোক অথবা গরমকাল, রামাদান মাস আসলেই তারা সব ধরনের কামনা ও অন্যায্য বাসনা পরিহার করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে রোজা পালন করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। পাশাপাশি নিজেদের চাহিদার তুলনায় আল্লাহর হুকুমকে বেশি অগ্রাধিকার দিলে, এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

এই যুব সম্প্রদায়ের মাঝে যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তারা হজ পালন করার চেষ্টা করে। কারণ তারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আল্লাহর ঘরও ভালোবাসে। তাই তারা সেসব জায়গাতেই যাওয়ার চেষ্টা করে, যেখানে গেলে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা অর্জন করা যায়। সেইসঙ্গে ওই পবিত্র স্থানগুলোতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে যে মুসলিম ভাইবোনেরা আসে, তাদের সঙ্গেও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে।

ন্যায়নিষ্ঠ এই যুবক-যুবতিরা বিশ্বাস করে, আল্লাহ যেমন তাদের সৃষ্টি করেছেন ঠিক একইভাবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই যুবকরা সৃষ্টির মাঝে প্রতিনিয়ত আল্লাহর নিদর্শন খুঁজে ফিরে। এ কারণেই আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে তাদের মাঝে কোনো সংশয় কাজ করে না। তারা প্রতি মুহূর্তে এ মহাবিশ্বের বিশালতা উপলব্ধি করতে পারে। শুধু আকারে বা আকৃতির বিশালতায় নয়; বরং এই গোটা বিশ্বজগৎ যে অদ্ভুত শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে চলছে, তাও এক আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করছে বলেই তারা উপলব্ধি করে।

বিশ্বজগতের প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার সর্বোচ্চ সক্ষমতা ও অসীম জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। এই নীতিবান ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন যুবকরা অনুভব করে, এত বিশাল জগৎ কখনোই একা একা সৃষ্টি হতে পারে না। আবার কোনো দুর্ঘটনা বা বিস্ফোরণ থেকেও সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ সৃষ্টির আগে এ পৃথিবীর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই যেখানে কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিল না, সেখান থেকে নতুন কোনো কিছুর সৃষ্টিও হতে পারে না। তাই এই বিশ্বজগৎ হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে কিংবা মহাবিশ্বের সব সৃষ্টি কাকতালীয়ভাবে শৃঙ্খলা মেনে চলছে, এমনটা হতেই পারে না। বরং সত্য এটাই, বিশ্বজগতের প্রতিটা জিনিস নির্দিষ্ট নিয়ম ও মাত্রা অনুযায়ী চলছে, কখনোই এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

"আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতিনীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।" (সূরা ফাতির : ৪৩)

আল্লাহ আরও বলেন,

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى
مِنْ فُطُورٍ- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

"তিনি সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে কোনো তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও; কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।" (সূরা আল মুলক : ৩-৪)

যদি আমরা এ কথা মেনে নেই, মহাবিশ্ব খুবই চমৎকার ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাহলে এমনটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই, বিশাল এই মহাকাশ ও বিশ্বজগৎ দুর্ঘটনাবশত সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বজগতের সৃষ্টি যদি দুর্ঘটনাবশতই হতো, তবে এতদিনে নতুন করে কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো এবং মৌলিক পরিবর্তন সংগঠিত হতো।

নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ যুবক-যুবতিরা আল্লাহর ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ফেরেশতাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়েছেন। রাসূলও ﷺ ফেরেশতাদের নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে ফেরেশতাদের বিবরণী, কার্যক্রম ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে।

এই যুবক-যুবতিরা আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ আসমানি এই গ্রন্থগুলোকে নবী-রাসূলদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তাঁরা মানুষদের সঠিক পথের দিশা দিতে পারে। কারণ ইবাদতসমূহের ভিতরে এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে যে সহজাত উপকারিতাগুলো রয়েছে, তা আসমানি নির্দেশনা ছাড়া কেবল মানবীক বিচার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এই আলোকিত যুবকরা বিশ্বাস করে, আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন যাতে তাঁরা মানুষদের সততা, নৈতিকতা ও কল্যাণের

দিকে ডাকতে পারেন এবং সব ধরনের অপকর্ম ও অনিষ্টতা থেকে বিরত রাখতে পারেন। একজন নবী বা রাসূল অনুভব করতেন, যাতে তাঁদের দাওয়াতি কার্যক্রমের পর সমাজে আল্লাহর বিরুদ্ধে নাফরমানি করার মতো আর কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট না থাকে। হযরত আদম (আ) ছিলেন আদি পিতা। আবার তিনিই প্রথম নবী হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন। আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এরপর আর কোনো নবী ও রাসূল আসবেন না। এ বিষয়টি নিয়ে সত্যনিষ্ঠ যুব সম্প্রদায় কোনো ধরনের সংশয়ে ভোগে না।

শুধু তা-ই নয়, তারা (ন্যায়নিষ্ঠ যুবসমাজ) শেষ বিচারের দিনের ওপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখে। শেষ বিচারের দিনটি এমন একটি দিন, যেদিন সকল মৃত মানুষদের পুনরায় জীবিত করা হবে এবং পার্থিব কাজের প্রতিদান প্রদান করা হবে। পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করেছে, তা সে শেষ বিচারের দিন দেখতে পাবে এবং এর যথাযথ পুরস্কার পাবে। একইভাবে, পৃথিবীতে যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করেছে, তাও সে দেখতে পাবে এবং এর প্রতিদান হিসেবে শাস্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা আল যিলযাল : ৭-৮)

এমন একটি দিনের প্রয়োজনও আছে। তা না হলে যারা দুনিয়াতে ভালো কাজ করেছে, নেক আমল করেছে, তাদের সেই সৎ কাজের মূল্যায়ন কীভাবে হবে কিংবা যারা খারাপ কাজ করছে তার প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ কীভাবে দেয়া হবে?

বিশ্বাসী এই যুবকরা ভাগ্যে বিশ্বাস করে। তারা জানে ভাগ্যে ভালো-মন্দ দুটোই থাকতে পারে। তবে যা-ই ঘটুক না কেন, তা আল্লাহর ফায়সালা ও সিদ্ধান্তক্রমেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ জীবনে যে ইতিবাচক উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয় কিংবা যে বিপদগুলো আসে, তার কারণ ও প্রভাবের ওপরও এই যুবকরা বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ এই যুবকদের বিশ্বাস অনেকটা এরকম, আল্লাহ হয়তো

তাদের ভাগ্যে কিছু ইতিবাচক বিষয় অথবা নেতিবাচক ভোগান্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন, কিন্তু তার নেপথ্যে প্রকৃতপক্ষে নানা কারণ ও প্রভাবও আছে- যার জন্য নিজেদের দায়ও কম নয়। আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করার জন্য এমন কিছু বিপত্তির মুখোমুখি করেন, যাতে আমরা সংশোধন হতে পারি।

সত্য পথের পথিক এই যুবক প্রজন্ম আল্লাহ তায়ালা, তাঁর নবী-রাসূল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি দায়বদ্ধ থেকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ধর্ম চর্চা করে। তারা অপর মুসলিম ভাইবোনদের সাথে স্বচ্ছতা বজায় রাখে। সবসময় উত্তম ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তাদের আচরণে কোনো ধরনের বেঈমানি, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, চক্রান্ত, অসদাচরণ, কুটিলতা এবং লুকোচুরি মানসিকতা দেখা যায় না।

যেভাবে এবং যে প্রক্রিয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনে মানুষকে সত্য পথে আহ্বান করার নির্দেশনা দিয়েছেন, এই যুবকরা ঠিক সেভাবেই মানুষদের দ্বীনের পথে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"আপনি আপনার পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান করুন হিকমতের সাথে, জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে এবং উত্তমরূপে। এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন গ্রহণযোগ্য পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই সে ব্যক্তি সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন যে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালোভাবে তাদেরকেও জানেন, যারা সঠিক পথে আছে।" (সূরা আন নাহল : ১২৫)

এই নীতিবান যুবক ও যুবতিরা যা কিছু ভালো সেদিকেই মানুষদের আহ্বান করে এবং অনিষ্টকর বিষয় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে এই কাজটিই যে কোনো উত্তম জাতি বা সম্প্রদায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

কারণ কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরা আল ইমরান : ১১০)

এই যুবকরা যখনই সমাজে কোনো অন্যায় ও অসঙ্গতি কিংবা অনাচার দেখে, তখন তারা রাসূলের ﷺ নির্দেশিত পথেই প্রতিবাদ করে এবং সমাজে শুদ্ধি অভিযান চালানোর চেষ্টা করে। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো মন্দ কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা হাত দিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করে; তেমনটা সম্ভব না হলে যেন মৌখিকভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, আর তাও যদি না পারে, তাহলে অন্তত যেন অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে। তবে তা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। (মুসলিম)

এসব ন্যায়নিষ্ঠ যুবক-যুবতিগণ সত্যকে গ্রহণ করে এবং সবসময় সত্য কথা বলে। কারণ তারা অনুধাবন করে কেবল সততাই আমাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবে। আর সঠিক পথে যেতে পারলে আমরা অবশ্যই জান্নাত লাভ করব। তাই একজন প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে।

ঈমানের একটি মৌলিক দাবি হলো, একজন মুসলমান সবসময় তার অপর মুসলমান ভাইবোনের জন্য কল্যাণকর ও উত্তম জিনিসটাই ভাববে। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত অর্থে ঈমানদার (বিশ্বাসী) হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে ঠিক একই জিনিস তার অপর ভাইয়ের জন্য বাছাই করতে পারবে।" অথবা এভাবেও বলা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের দাবি পূরণ হবে না, যতক্ষণ না একজন ব্যক্তি নিজেকে যেভাবে ভালোবাসে ঠিক একইভাবে অপর মুসলিম ভাইকে ভালোবাসতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

স্বার্থক এই যুবকরা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ, নিজের জন্মভূমি এবং সর্বোপরি নিজের কল্যাণের ব্যাপারে তারা সর্বদা সচেতন ও তৎপর থাকে। সব ধরনের স্বার্থপরতা এবং

ব্যক্তিগত ফায়দা লাভের মানসিকতা প্রত্যাখ্যান করে, মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে।

তারা আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় তাঁরই নির্দেশিত পথে থাকার চেষ্টা চালায়। এই নীতিবান যুবকরা মানুষকে দেখানোর জন্য কোনো কাজ করে না। বরং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই কাজ করে। কোনো ধরনের প্রশংসার পেছনে ছোটে না। কেবল নিজের মেধা ও শক্তির ওপর নির্ভর করে সত্যপথে বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে যায়। তারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ধর্মীয় কাঠামোর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে কোনো ধরণের অতিরঞ্জন বা অবহেলাকে তারা প্রশ্রয় দেয় না। অর্থাৎ নির্ধারিত সীমার বাইরে যাওয়ার জন্য তারা যেমন কোনো বৈধ বিষয়কে নিজের মতো করে বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে না, ঠিক তেমনিভাবে পরিষ্কার কোনো বিধান নিজেদের স্বার্থে এড়িয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করে না। সেই সাথে, তারা কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে এবং জান ও মাল কুরবানী করে ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

এই যুবকরা ধার্মিক এবং তাদের ব্যবহার, আচার-আচরণও উত্তম। তারা সদাচারী। তারা ধর্মের উত্তম অনুশীলনকারী, উদার, মহৎ, কোমল ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী। তারা ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু এবং একইসঙ্গে দৃঢ় ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা কোনো সুযোগই হেলায় ছেড়ে দেয় না। আবার আবেগকে যৌক্তিকতা ও বুদ্ধি বিবেচনার ঊর্ধ্বে প্রশ্রয় দেয় না। সেই সাথে, তারা সমাজের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কাজ করে যায়।

ভারসাম্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল এই যুবক-যুবতিরা বুদ্ধিমত্তার সাথে নীরবে কাজ করে। তারা কাজগুলো নিখুঁত ও মানসম্পন্ন করার চেষ্টা করে। তারা জীবনের কোনো প্রান্তেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। বরং সুযোগ কাজে লাগিয়ে কীভাবে নিজেদের ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ করা যায়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। যদিও এই যুব সম্প্রদায় ধর্মের অনুশীলন করে এবং উত্তম ব্যবহারের চর্চা করে, তা সত্ত্বেও তারা সে সব প্ররোচণা ও ওয়াসওয়াসার ব্যাপারে সতর্ক থাকে, যেগুলো তাদের মানবীক গুণগুলো নষ্ট করে দিতে পারে। এসব প্ররোচক উপকরণের মধ্যে রয়েছে কুফরি, নাস্তিকতা, লাম্পট্য, অসৎ চরিত্র, অপব্যয়, আনুগত্যহীনতা, অশ্লীল আচরণ এবং অনৈতিক লেনদেন।

এই আলোকিত যুবকরা আমাদের জন্য স্বস্তি ও প্রশান্তির কারণ। তারা মূলত জীবন, উন্নয়ন এবং দ্বীন ইসলামের প্রতিচ্ছবি। তারা হলো সেই কাঙ্ক্ষিত সম্প্রদায়, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের সংকটগুলোকে কাটিয়ে ওঠার তাওফিক দিবেন বলে আমরা আশা করি। আমরা মনে করি, এই সদাচারী যুবকরা অনেক মুসলমানদের জন্য এবং বিশ্ববাসীর জন্য আলোকিত পথের দিশা হয়ে টিকে থাকবে। মূলত তারাই হলো সেসব সৌভাগ্যবান যুবক, যাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে।

দুর্নীতিগ্রস্ত যুব প্রজন্ম

এরা হলো সেসব যুবক যারা ধর্ম থেকে বিচ্ছিন হয়ে পড়েছে, আচরণগতভাবে বেপরোয়া এবং নিজেদের পাপে ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছে। তারা অন্য কারও থেকে সত্যবচন শুনতে চায় না, মানতেও চায় না। মিথ্যা ও প্রতারণার পথ থেকে ফিরে আসতে চায় না; বরং মনের মাঝে মিথ্যাকে ভীষণভাবে গেঁথে ফেলেছে। তাছাড়া, তারা আচরণের দিক থেকেও প্রচণ্ড স্বার্থপর হয়।

এ ধরনের যুবকরা প্রচণ্ড একগুয়ে হয়। তারা সত্যকে কোনো ধরনের সুযোগ দিতে চায় না। ফলে বান্দার প্রতি আল্লাহর অধিকার কিংবা তার প্রতি অন্য মানুষের যে অধিকার- তারা এসব কোনো কিছু নিয়েই পরোয়া করে না।

এই শ্রেণির যুবকেরা সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। চিন্তা, আচরণ এবং ব্যবহারের দিক থেকেও ভীষণ একপেশে হয়। তারা নিজেদের মতামত নিয়ে অহংকার করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কেবল তারাই যেন সত্যি কথা বলে আর কেউ বলে না। তারা নিজেদের সবধরনের ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করে আর বাকি সবাইকে ভুলে নিমজ্জিত বিবেচনা করে। নিজেদের মতের সাথে দ্বিমত করলে, তারা অপরকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী বলেও সমালোচনা করে।

দ্বীন ইসলামের সত্য সুন্দর সরলপথ থেকে যারা বিচ্যুত হয়, তাদের আচরণেও নানা ধরনের নেতিবাচক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। খারাপ ও অনৈতিক কাজগুলোকে তারা নানা যুক্তি দিয়ে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বানানোর চেষ্টা করে। ফলে তারা নিজেরাই ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"তারাই সে লোক, যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে। (সূরা আল কাহফ : ১০৪)

তারা যেমন নিজেদের ধ্বংসের কারণ তেমনি সমাজেরও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ। তাদের কারণে উম্মাহ পতনের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। মুসলিম উম্মাহর যে ইতিবাচক ভাবমূর্তি ছিল, তা এসব দুর্নীতিগ্রস্ত যুবকদের অপকর্মের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এ যুবকরা গোটা সমাজ, রাষ্ট্র ও উম্মাহর জন্য একটি ভয়ঙ্কর ব্যাধির কারণ। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এই ব্যাধি থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

সংশয়গ্রস্ত যুব প্রজন্ম

এরা এমন সব যুবক-যুবতি যারা সমস্ত বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তায় ডুবে থাকে। তাদের অবস্থা এমন যেন পথের মাঝখানে বিভ্রান্ত অবস্থায় আটকা পড়ে আছে, বুঝতে পারছে না গন্তব্য কোথায়। হয়তো তারা একটি ধর্মীয় রক্ষণশীল সমাজে বসবাস করছে, কিন্তু তাদের সামনে বিপথগামী হওয়ার অবারিত সুযোগ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই যুবকরা ধূর্ততার অংশ হিসেবে বাজে প্রবৃত্তিগুলোর কাছে কাবু হয়ে পড়ে। এমনকি ইসলামের সত্যতা নিয়েও তাদের মাঝে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। ফলে, তাদের আচরণ ও ব্যবহারে দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে, নৈতিকতার অবক্ষয় হয় এবং প্রচলিত অভ্যাস, ঐতিহ্য ও প্রথায় ব্যাপক অবনতি ঘটে।

এই যুবকরা এমন এক মনস্তাত্ত্বিক জায়গায় অবস্থান করে, যেখানে তাদের নানা ধরনের সন্দেহ আর সংশয় আবিষ্ট করে রাখে। তারা দুটো পথের মধ্যে সনাক্ত করতে পারে না, কোন পথটি সঠিক। তাদের পূর্বপুরুষরা যা করে গেছে কিংবা যা করার জন্য বলে গেছে তা-ই সঠিক, নাকি পশ্চিমা জগৎ থেকে প্রতিনিয়ত যে চিন্তার আগমন ঘটছে তা সঠিক? এই যুবকরা এতো বেশি সংশয়ে ডুবে থাকে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে ধারণ করে, আবার কিছু ক্ষেত্রে পশ্চিমা চিন্তাধারা অবলম্বন করে। বিশেষ করে কোন দিকে গেলে লাভ বেশি হবে কিংবা সমাজের বাস্তবতা বিবেচনা

করে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সত্য পথ তাদের কাছে খুব একটা গুরুত্ব পায় না।

এ ধরনের সংশয়বাদী যুবকরা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়। তাই তাদের সত্য ও সঠিক পথের দিকে রীতিমতো ধরে বেঁধে আনতে হয়। যদি সেই সমাজে সত্যনিষ্ঠ দায়ী থাকে, তবে কাজটা তুলনামূলক সহজ হয়। কারণ তিনি নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং উত্তম নিয়তের বরকতে সংশয়ে থাকা এসব যুবকদের সত্য পথে নিয়ে আসতে পারেন।

এই যুবকরা হয়তো জীবনের একটা পর্যায়ে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। কিন্তু জীবনের অপর স্তরে গিয়ে পশ্চিমা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করেছে, যা ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফলে তারা পরস্পর বিরোধী দুটো জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় করতে না পেরে, সংশয়ে পড়ে যায়।

সংশয়ে ডুবে থাকা এই যুব সম্প্রদায় নিজেদের খুব সহজেই এসব দোটানা থেকে বের করে আনতে পারে, যদি তারা ইসলামি জ্ঞানের প্রকৃত উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে শিক্ষা অর্জন করে। পাশাপাশি, যদি ইসলামের প্রকৃত সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্যে আসার সুযোগ পায়, তবেও এ ধরনের পথভ্রষ্টতা ও সংশয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও নেয়ামত সর্বাধিক অপরিহার্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি ও অন্যান্য সংকট

যুব সম্প্রদায়ের দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠার নেপথ্যে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যৌবনে থাকা অবস্থায় মানুষ নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। যৌবনকাল মূলত জীবনের বৈপ্লবিক বিবর্তন সাধন করার মতো একটি সময়। জীবনের এই সময়টাতে এসেই একজন যুবক অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পরিণত হতে থাকে। তাই এই সময়টাতে যুবকদের আত্মসংযম শেখানো দরকার; যেন তারা নিজেদের ধরে রাখতে পারে। তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করা দরকার। একইসঙ্গে দায়িত্বশীল নেতৃত্বও প্রয়োজন, যে নেতৃত্ব তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারবে।

যুব সম্প্রদায়ের মাঝে দুর্নীতির যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো :

এক : কর্মসংস্থানের অভাব

বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানের অভাব। এই সংকট এমন একটি ব্যাধি যা একজন মানুষের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শারীরিক সক্ষমতাকে আশঙ্কাজনকভাবে কমিয়ে ফেলে। মানুষের সহজাত প্রবণতা হলো, তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবে, কাজ করবে ইত্যাদি। তাই মানুষকে যদি এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা হয় অর্থাৎ কাজ করার সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানায় পরিণত হবে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা-সবই অপাঙক্তেয় হয়ে যায়। মানসিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং অন্তরে নানা ধরনের দুশ্চিন্তা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা বাসা বাঁধে। এই বাজে চিন্তাগুলো হতাশা তৈরি করে। ফলে, তারা বিপথগামী হয়ে পড়ে। আর এই গোটা পরিস্থিতি তৈরি হয় কেবল বেকারত্বের কারণেই।

এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে রোগাক্রান্ত যুবকদের বিভিন্ন গঠনমূলক ও ইতিবাচক কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে। যখন তারা পড়াশোনা, লেখালেখি কিংবা ছোটখাটো ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, কেবল তখনই সেই ব্যক্তি এবং কর্মহীন সময়ের মাঝে ভারসাম্য হবে। শুধু তা-ই নয়, পরিবার ও

সমাজের জন্য তারা হতাশাব্যাঞ্জক হবে না; বরং উপকারী ও সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে। ফলে, তারা নিজের জন্য তো বটেই এমনকি অন্য মানুষদের জন্যও ইতিবাচক কাজ করার অবস্থায় পৌঁছতে সক্ষম হবে।

দুই : বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে ব্যবধান

এই সমস্যাটা তখন শুরু হয় যখন পরিবার বা সমাজের বয়স্ক লোকেরা যুবকদের মাঝে নানা ধরনের অসততা ও দুর্নীতির উপস্থিতি দেখতে পায়। এই পরিস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের সংশোধন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নিয়ে বরং এড়িয়ে যায়। বয়স্ক এসব ব্যক্তি মোটামুটিভাবে হাল ছেড়ে দেয় এবং ভাবে, যুবকরা সব গোল্লায় গেছে। একটা পর্যায়ে তারা এসব দুর্নীতিগ্রস্ত যুবকদের ঘৃণা করতে ও ভয় পেতে শুরু করে। এই বয়োজ্যেষ্ঠ বা মুরুব্বি ব্যক্তিরা ভালো-মন্দ কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং নিষ্ক্রিয়তায় ডুবে থাকে। তারা মনে করে, যুবকরা সব নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের মানসিক চিকিৎসা দরকার। যখন এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন গোটা সমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বয়স্ক ও যুবক-এই শ্রেণি দুটি তখন একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা লালন করতে শুরু করে।

এ সমস্যাটি খুব সহজেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, যদি যুবক ও প্রবীণ প্রজন্ম পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং নিজেদের মধ্যকার বিদ্যমান বিভাজন ও দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করে। প্রত্যেকেরই মনে রাখা দরকার, সমাজে নবীন ও প্রবীণ প্রজন্ম কার্যত একই দেহের দুটি অংশ। তাই এ দুই অংশের কোনো একটি যদি ক্ষয়ে যায়, তবে অপর অংশটিও সুষ্ঠভাবে টিকে থাকতে পারবে না। সার্বিকভাবে গোটা দেহ তথা পুরো সমাজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

যুবকদের প্রতি প্রবীণ সম্প্রদায়ের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তাদের এই দায়িত্বগুলো অবশ্যই কাঁধে তুলে নিতে হবে। যুবকদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর ওপর, যিনি যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। আল্লাহর সাহায্য কামনা করে চেষ্টায় নামলে তাতে সফলতা আসবেই। আল্লাহ মানবজাতির জন্য হেদায়েত বা দিকনির্দেশনা পাঠিয়েছেন। এই দিকনির্দেশনাগুলো যদি যুবকদের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে তারা চাইলেও হেদায়েতের আলো

থেকে দূরে থাকতে পারবে না। আল্লাহ চাইলে হয়তো একটা সময় তারা সত্য পথে ফিরে এসে দ্বীনের পথে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

অন্যদিকে যারা যুবক, তাদের উচিত প্রবীণ ব্যক্তিদের আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করা। প্রবীণরা যে মতামত ও নির্দেশনা দিচ্ছে, তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখা যুবকদের দায়িত্ব। এই প্রবীণ ব্যক্তিরা জীবনের অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। তাদের অভিজ্ঞতার ভান্ডার অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তারা জীবনের এমন সব বাস্তবতা জানে ও বোঝে, যা যুবকদের এখনও দেখার সুযোগ হয়নি। প্রবীণদের এই অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জ্ঞান যখন যুব প্রজন্মের টগবগে শক্তির সঙ্গে মিলিত হবে, ঠিক তখনই আল্লাহর ইচ্ছায় সমাজ দ্রুতবেগে সফলতার পানে অগ্রসর হবে।

তিন : দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের সাহচর্যে থাকা

অসৎ সঙ্গ যুবকদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক এবং নৈতিক দিক থেকে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন খেয়াল রাখে, কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।" (আবু দাউদ : ৪৮৩৩)।

রাসূল ﷺ আরও বলেন, "একজন ভালো ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হলো, যথাক্রমে একজন আতর বহনকারী ব্যক্তি ও আগুনের চিমনির মতো। যিনি আতর বহন করছেন, তিনি নিজের সংগ্রহ থেকে আপনাকে আতর উপহার দিতে পারেন। আবার আপনি কিনেও নিতে পারেন। দুটোর কোনোটাই যদি না হয় অন্তত তার কাছে গেলে আপনি সুবাসটুকু পাবেন। আর যে সঙ্গীটি আগুনের চিমনির মতো, সে খুবই মারাত্মক। হয় সে আপনার পোশাকে আগুন ধরিয়ে দেবে, নতুবা তার কাছে গেলে পোড়া গন্ধ পাবেন।" (সহীহ আল বুখারী, ৫৫৩৪)

এই সমস্যার সমাধান করতে হলে যুব সম্প্রদায়কে নীতিবান, ভালো, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সংগী হিসেবে বাছাই করতে হবে। তবেই তারা এই মানুষদের থেকে ভালো কিছু শিখতে পারবে। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। কাউকে বন্ধু বানানোর আগে তার শিক্ষাগত অবস্থান ও সুনামের বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে। যদি সেই ব্যক্তির চরিত্র উন্নত

হয়, ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিক হয় তবেই বন্ধুত্ব করতে হবে। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে যত বেশি সম্ভব সময় কাটাতে হবে।

প্রকারান্তরে বিপরীত চরিত্রের মানুষের ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। তাদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতে হবে, মিষ্টি কথায় এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া যাবে না। কারণ এ ধরনের মানুষেরা অনেক বেশি ছলচাতুরি করতে পারে। অসৎ চরিত্রের লোকেরা মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। তারা চায় যেভাবে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে, আশপাশের মানুষরাও যেন সেভাবেই ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। এটা শয়তানেরও ধর্ম।

এ কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, "বন্ধু বানাবার আগেই তুমি তাকে নিয়ে ভাবো, তাকে নিয়ে চিন্তা কর, তার কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা কর। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, যদি তুমি কোনো বুদ্ধিমান ধার্মিক মানুষকে পাশে পেয়ে যাও, তবে তাকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে নাও।"

চার : ধ্বংসাত্মক ও ইসলামবিরোধী বই, ম্যাগাজিন পড়া এবং টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে অশ্লীল আয়োজন প্রত্যক্ষ করা

এ ধরনের ইসলামবিরোধী অশ্লীল উপাদানগুলো মানুষের মাঝে ধর্ম ও ঈমানের ব্যাপারে অনীহা ও নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। ফলে তারা উন্নত নৈতিকতার চর্চা থেকে সরে গিয়ে পতনের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। একটা পর্যায়ে গিয়ে তার ভেতরে নানা ধরনের অবিশ্বাস ও ধর্ম বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয়। এমতাবস্থায়, যুবক সম্প্রদায় কেবল ইসলামি শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই এই সঙ্কট মোকাবেলা করতে পারে। ইসলামিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ যুবকদের মানসিক প্রশান্তি দেয় এবং নৈতিকতার বাতি প্রজ্জ্বলন করে। ফলে তারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে এবং জীবনের জন্য কোনটা উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর, তা চিহ্নিত ও সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

অশ্লীলতা ও পাপাচারের দিকে ছুটে গেলে যুব সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবেই বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন তারা কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আজেবাজে জিনিস

নিয়ে ভাবতে শুরু করে। প্রকারান্তরে ধর্মীয় শিক্ষা তাদের মনে কিছু ইতিবাচক ও গঠনমূলক উপকরণ শক্তভাবে গেঁথে দেয়। ফলে একদিকে তারা যেমন বাজে চিন্তার মোকাবেলা করতে পারে, অন্যদিকে বোঝাপড়া ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ এবং মজবুত হয়। তাদের চিন্তাধারা এবং জীবনযাপনে সেই স্বচ্ছতার একটা ইতিবাচক প্রভাবও প্রতিফলিত হতে শুরু করে।

এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে যুবকদের এমন সব লেখনি পড়তে হবে এবং এমন সব অনুষ্ঠান দেখতে হবে, যেগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ নাম বেশি বেশি উচ্চারিত হয়। পাশাপাশি, যে বইগুলো ঈমান মজবুত করে, সেসব বই অধ্যয়ন করার পরিমাণ বাড়াতে হবে। তাদের সবসময় কল্যাণকর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এতে আত্মা যে কোনো ধরনের প্ররোচণা মোকাবেলা করতে পারবে এবং নিজেকে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। দেখা যাবে, আগে যে অশ্লীল বইগুলো পড়তে ভালো লাগত বা যে বাজে ভিডিওগুলো দেখতে মজা লাগত, সেগুলো আর ভালো লাগবে না। বিপরীতে ইতোপূর্বে ধর্মীয় বই পড়তে যে বিরক্তি ভাব কাজ করতো তাও কেটে যাবে। বরং তারা ধর্ম সংক্রান্ত বইয়ের মাঝেই অধিক তৃপ্তি ও কল্যাণ খুঁজে পাবে। আমরা এটাকে রেসলিং খেলার সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যেখানে একজন ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে থাকা আত্মা সব সময় চাইবে ধ্বংসের দিকে যেতে। আর আমাদের শয়তানের সাথে লড়াই করেই আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

এক্ষেত্রে বেশ কিছু বই রয়েছে, যা আমাদের উপকারে আসতে পারে। সর্বপ্রথম যে বইটি পড়লে আমরা সর্বাধিক উপকৃত হব, তাহলো আল কুরআন ও কুরআনের তাফসির। এই তাফসিরগুলোতে মুফাসসিরগণ আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস উদ্ধৃত করে আমাদের জন্য মূল প্রেক্ষাপটকে অনুধাবন করার রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি নিয়মিতভাবে হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে। এর পরের স্তরে, আমাদের সেই সব গ্রন্থ ও ইসলামি সাহিত্য পড়ার চেষ্টা করতে হবে, যেগুলো প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রচনা করে গেছেন।

পাঁচ : ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা

আমাদের চারপাশে এমন অনেক যুবক রয়েছে, যারা মনে করে ইসলাম পালন করলে স্বাধীনভাবে কোনো কিছুই করা যায় না। তাছাড়া, মানুষের স্বাভাবিক কর্মস্পৃহা এবং উদ্দীপনার ওপরও ইসলাম অনেক বেশি কড়াকড়ি আরোপ করে। এই ধারণা থাকার কারণে যুবকদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। তাদের অনেকেই ইসলামকে একটি পশ্চাদমুখী ধর্ম মনে করে। তারা বিশ্বাসও করে, ইসলাম মানুষকে সবসময় পিছন থেকে টেনে ধরে, সামনে এগোতে দেয় না এবং সার্বিকভাবে উন্নতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে ইসলামের প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য এই যুবকদের সামনে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তারা ইসলামের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানার সুযোগ পায় না। জ্ঞানের অভাবের কারণেই তাদের মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণার জন্ম হয়।

সেজন্য বলা হয়, "যার মুখের স্বাদ আগে থেকেই তেতো, তাকে যদি পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল ও সুমিষ্ট পানীয়ও পান করানো হয়, তারপরও তার কাছে সেই পানির স্বাদ তেতোই লাগবে।"

প্রকৃত সত্য হলো, ইসলাম মানুষের স্বাধীনতার ওপর কোনো ধরনের অবরোধ আরোপ করে না। বরং ইসলামের নিয়মকানুন ও বিধিবিধানগুলো এতোটাই সুন্দরভাবে প্রণীত যে, নির্ধারিত কাঠামোর আওতায় কোনো একজন মানুষের স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদনের কারণে অপর মানুষের স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যে মানুষটি অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়, সে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, এই অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করতে হলে অপর মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার ক্ষুণ্ন করতেই হবে। আর তেমনটা হলে দুজন মানুষের মধ্যে সংকট তৈরি হতে পারে। আর সেই সংকট থেকেই ধীরে ধীরে গোটা সমাজে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে এবং সমাজ থেকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে।

এ কারণে আল্লাহ হুদুদ বা সীমানার আইন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন কোনো বিষয়কে হারাম ঘোষণা করার প্রশ্ন আসে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। আল্লাহ এমনভাবে তাঁর নিদর্শনসমূহকে মানুষের জন্য বর্ণনা করেন যাতে তারা বাঁচতে পারে।" (সূরা বাকারা : ১৮৭)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।" (সূরা আল বাকারা : ২২৯)

সংশয়ে থাকা এই যুবকরা যেগুলোকে সীমাবদ্ধতা বলছে, সেই তথাকথিত সীমাবদ্ধতা আর আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই মানুষের ফিতরাত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর থেকে ভালো আর কেউই জানে না। এ কারণে মানুষের চরিত্র বিবেচনায় নিয়ে, মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই তিনি এই বিধিবিধানগুলো প্রণয়ন করেছেন।

এ কারণেই আল্লাহর দেয়া বিধিবিধানগুলোকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গণ্য করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এ নিয়মকানুনগুলো মানব জীবনের প্রতিটি স্তর ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে, অত্যন্ত যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিকভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। আর মানুষ সহজাতভাবেই আইন মানতে চায় বা মেনে চলতে হয়। যদি একটু খোলাসা করে বলি, মানুষ ক্ষুধা ও পিপাসার কাছে কাবু হয় বলেই, খাবার ও পানীয়র সন্ধানে বের হতে হয়। তাই বলে যখন তখন যে কোনো জিনিস খেতে পারে না; একটি নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়। আর সে কারণেই মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিমাণ, মান ও ভিন্নতাকে বিবেচনায় নিয়ে এবং সর্বোপরি সুস্থতা ও নিরাপত্তা মাথায় রেখে খাবার খেতে হয়। আর মানুষ নিয়মের বাইরে গেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সমাজে বসবাসরত মানুষেরা সামাজিক আইনকানুন ও বিধিবিধান মেনে চলার ব্যাপারে অনুগত হয়। যে মানুষ যে দেশে বসবাস করে তাকে সেই দেশের আইনের প্রতি অনুগত থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ সামাজিকভাবে প্রচলিত পোশাক পরিধান করে। সমাজে যে ধরনের বাসস্থানের কাঠামো চালু থাকে মানুষ সেখানেই বসবাস করে এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রেও প্রচলিত যানবাহন ও নিয়মকানুন মেনে চলে। যদি কেউ এই নিয়মকানুন বা প্রচলিত অভ্যাস ও প্রথাগুলো অগ্রাহ্য করে, তবে তাকে অসামাজিক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার সঙ্গে কেউ থাকতে চায় না।

মানুষের যাপিত জীবন মানেই হলো কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম, আইনকানুন ও বিধান অনুসরণ করা। নিয়মের মধ্যে থাকলে সামাজিক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। যদি সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন ঘটানো বা নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব হয়, তবে কারোরই সেই নিয়মের বাইরে থাকা উচিত নয়। ঠিক একইভাবে ইসলামিক আইনকানুনও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের স্বার্থেই প্রণয়ন করা হয়েছে। তাহলে কিছু মানুষ কীভাবে ইসলামের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হতে পারে কিংবা মনে করতে পারে, ইসলামি এসব নিয়মকানুনের মাধ্যমে স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সত্যিকারার্থে এই কথাগুলো পুরোপুরি মিথ্যা, বানোয়াট এবং পাপাচারের বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ।

অধিকন্তু ইসলাম কোনোভাবেই মানুষের শক্তি, কর্মস্পৃহা ও উদ্দীপনাকে আটকে রাখে না। বরং ইসলাম মানুষকে মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের ভাবনা, ধ্যান ও সাধনাকে এমনভাবে সংযুক্ত করে যে, মানুষ খুব সহজেই মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি ঘটাতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

"বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে জোড়া হিসেব করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর।" (সূরা সাবা : ৪৬)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ

"তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমূহে ও যমীনে কি রয়েছে। এসব নিদর্শন এবং ভীতিপ্রদর্শন তাদের জন্য নয়, যারা এগুলোতে বিশ্বাস করে না।" (সূরা ইউনুস : ১০১)

ইসলাম কেবল মানুষের ভাবনা এবং সেই ভাবনার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকেই উৎসাহিত করে না; বরং কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা না করে, তবে ইসলাম এ ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

"তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা বস্তু সামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্তুত এরপর তারা আর কিসের ওপর ঈমান আনবে? (সূরা আল আরাফ : ১৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

"তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু অত্যন্ত চমৎকারভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এরপরও অনেক মানুষ বিশ্বাসই করে না যে, তাদের সাথে তাদের রবের আবারো সাক্ষাৎ হবে।" (সূরা আর রুম : ৮)

আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

"আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তারপর আবার তাকে সৃষ্টির আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না?" (সূরা ইয়াসিন : ৬৮)

মানুষের ভাবনা চিন্তা করার ক্ষমতা মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতকে উন্মোচিত করে। প্রকৃতিতে আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিদ্যমান নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা করার জন্য ইসলাম বার বার মানুষকে তাগিদ দিয়েছে। এ ধরনের চিন্তা করলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাহলে কিছু মানুষ কীভাবে এরকম অ দ্ভুত দাবি করে, ইসলাম তার কর্মস্পৃহা ও উদ্দীপনা দমিয়ে রাখে?

আল্লাহ পাক বলেন,

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

"এ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত কঠিন তাদের মুখের কথা। অথচ তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা।" (সূরা আল কাহফ : ৫)

যেসব বিনোদন শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিকারক নয় বরং কল্যাণকর, সে সবই ইসলাম বৈধতা দেয়। ইসলাম সুস্বাদু খাবার ও পানীয়কে মানুষের জন্য হালাল ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ পাক বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদের রিজিক হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।" (সূরা আল বাকারা : ১৭২)

পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ
إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় কর না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল আরাফ : ৩১)

যেসব পোশাক রুচিসম্মত এবং যা মানবীক প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ তা পরিধান করার ব্যাপারে ইসলাম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"হে বনী-আদম আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং তাকওয়ার পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা আল আরাফ : ২৬)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"আপনি বলুন, আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে হালাল করেছে। আপনি বলুন, এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা বুঝে।" (সূরা আল আরাফ: ৩২)

ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে নর-নারীকে একে অপরের সান্নিধ্যে থেকে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই করাই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা : ৩)

মানুষের সম্পদ নির্মাণ ও উপভোগের ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো বাধা দেয়নি; যদি তা অন্যের হক নষ্ট করে না হয়। বরং ইসলাম মানুষকে নির্ধারিত মুনাফা লাভ করার সুযোগ দিয়েছে এবং বৈধভাবে অর্থ সম্পদ রোজগারের পথ সৃষ্টি করে দিয়েছে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে তা প্রমাণিত হয়,

"আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল বাকারা : ২৭৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার ওপর বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছেই তোমাদের পুনরুজ্জীবন হবে।" (সূরা আল মুলক : ১৫)

পবিত্র কুরআনের অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অতঃপর নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর, রুজির সন্ধানে বেরিয়ে যাও ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আল জুমআ : ১০)

উপরোক্ত সকল তথ্য, প্রমাণ ও রেফারেন্সের পর কারও মধ্যে আদৌ কি এই ধারণা জিইয়ে রাখার সুযোগ আছে, ইসলাম মানুষের মেধা, সুযোগ ও সক্ষমতা কে দমিয়ে রাখে!

তৃতীয় অধ্যায়

খারাপ চিন্তার প্রভাব

ভাবনা ও মোহ তথা বিভ্রমের বিষয়টি ধর্মের সাথে খুব একটা সংগতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া, নিষ্প্রাণ আত্মা কখনো এ ধরনের বিষয়ে প্রভাবিত হয় না। কারণ ইতোমধ্যেই সেই অন্তর থেকে জীবনী শক্তি হারিয়ে গেছে এবং বিপথগামী হয়ে গেছে। আর শয়তানও মানুষের মনকে এমন পথভ্রষ্ট ও নিষ্প্রাণ বানিয়ে ফেলতে চায়।

একবার এক প্রবীণ আলেমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা দাবি করে শয়তান কখনোই তাদের প্ররোচিত ও প্রভাবিত করতে পারে না। এ প্রসংগে আপনার অভিমত কী? জবাবে সেই প্রবীণ আলেম বলেছিলেন, তারা তো ঠিকই বলেছে। যে বাড়ি ইতোমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে, শয়তান সেখানে খামোখা সময় নষ্ট করবে কেন?"

অন্যদিকে, যদি কোনো অন্তরে সজীবতা ও জীবনীশক্তি বিদ্যমান থাকে এবং ঈমান বলিষ্ঠভাবে টিকে থাকে, তখন শয়তান সেই সজীব অন্তরের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। শয়তান সেই অন্তরে নানাভাবে ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক চিন্তা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই প্ররোচনার ফাঁদে পা দেয়, তাহলে সেই যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। শয়তান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রথমে প্রভু, দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি করে। যদি শয়তান অনুভব করে, লোকটার মনে প্ররোচণার প্রভাব পড়েছে এবং দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তখন শয়তান আরও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। শয়তান সেই ব্যক্তিকে ধর্ম থেকে বের না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না।

যাহোক, শয়তান মানুষের অন্তরে যত ধরনের খারাপ প্রবৃত্তি ও ওয়াসওয়াসা প্রবেশ করাক না কেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেখান থেকে খুব সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে; যদি কুরআন ও হাদীসের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

"যদি কোনো সময় শয়তান তোমাকে উস্কানি দেয় তাহলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। যারা সতর্ক-মুত্তাকি, শয়তানের কারণে কোনো মন্দ ভাব তাদের মনে জাগার সাথে সাথেই তারা সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায়। তখন তারা স্পষ্ট দেখতে পায় যে, তাদের জন্যে সঠিক পথ কোনটি।" (সূরা আল আরাফ : ২০০-২০১)

এই ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর অনেকগুলো হাদীসও পাওয়া যায়।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "একবার একজন ব্যক্তি রাসূলের ﷺ কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার মাথায় মাঝে মাঝে এমন সব চিন্তা আসে, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার জন্য অধিক সহজ। নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, আল্লাহর শুকরিয়া, আল্লাহ (তোমার) এ বিষয়কে কল্পনার সীমা পর্যন্তই আবদ্ধ রেখেছেন।" (আবু দাউদ : ৫১১২)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, "সাহাবিদের একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কখনো কখনো অন্তরে এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা খুব কঠিন মনে হয়। রাসূল ﷺ বললেন, সত্যিই কি তোমরা এ রকম পেয়ে থাক? তারা বললেন, হ্যাঁ! আমরা এ রকম অনুভব করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটি তোমাদের বিশুদ্ধ ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণ।"
(মুসলিম, আবু দাউদ : ৫১১১)

বিশুদ্ধ ঈমান হলো এমন একটি শক্তি, যা অন্তরে আসা বাজে চিন্তা, প্ররোচণা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং এমন কিছু লক্ষণ পাওয়া যায় যাতে মনে হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমান প্রকৃত অর্থেই বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল অবস্থায় রয়েছে।

রাসূল ﷺ আরও বলেন, "শয়তান হয়তো একদিন তোমার কাছে এসে বলতে পারে, কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে? এভাবে সে তোমার মনে আরও বেশ কিছু প্রশ্নের উদ্রেগ করতে পারে। এরকম প্রশ্ন করতে করতে যখন সে তোমার মাথায় এই চিন্তাটা নিয়ে আসবে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং বলবে, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম। সেই সাথে সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের চিন্তা করা

থামিয়ে দিতে হবে।" (সহীহ আল বুখারী : সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, শয়তান ও তার বাহিনীর কর্মপদ্ধতি অনুচ্ছেদ, হাদীস নম্বর ৩০৩৪)

অন্য আরেক বর্ণনায় কথাটা এভাবে এসেছে, রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার পাশাপাশি এই কথাটিও বলতে বলেছেন, "আমি আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করি।" (মুসলিম : ২২০৩)

কিছু মানুষ আছে যারা অতিরিক্ত প্রশ্ন করে। তাদের অভ্যাসটাই এরকম; কৌতূহল বেশি। এরকম প্রশ্ন করতে গিয়ে তাদের মধ্যে হঠাৎ কেউ বলে বসতে পারে, আল্লাহ তো সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন; তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে? এরকম প্রশ্ন শোনামাত্রই তোমরা বলবে,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"তিনি আল্লাহ, যিনি একক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর মূল আশ্রয়দাতা। তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। তার সমকক্ষও কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস : ১-৪)।

এরপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি চেয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (আস সুয়ুতি)।

উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাসূল ﷺ এর সামনে তাঁর সাহাবিরা মনের ভিতরে জমে থাকা সমস্ত চিন্তাগুলো প্রকাশ করতেন এবং এর প্রেক্ষিতে তিনি তাদের পরামর্শ প্রদান করতেন। হাদীসগুলো পর্যালোচনা করে মূলত চারটি আমল করার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এগুলো হলো:

১. আন্তরিকভাবে এসব ওয়াসওয়াসার চর্চা পরিহার করা এবং এমনভাবে ভুলে যাওয়া যেন, কখনো এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সেইসঙ্গে, মনে ভালো ভালো ভাবনা নিয়ে আসা এবং শুভ চিন্তা করার অভ্যাস করা।

২. এ ধরনের বাজে চিন্তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া এবং শয়তানের তৎপরতা থেকে নিষ্কৃতি চেয়ে দোয়া কামনা করা।

৩. বারবার এই কথাটি বলা, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ﷺ ওপর ঈমান এনেছি।

৪. বারবার সূরা ইখলাস পাঠ করা।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস : ১-৪)।

তারপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা এবং বলা, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্বদর নিয়ে সংশয়

আরও একটি বিষয় রয়েছে, যা যুবকদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে; ক্বদর (তাকদীর তথা পূর্বনির্ধারিত ফায়সালা)। ক্বদরে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম মৌলিক দাবি। ক্বদরের প্রতি বিশ্বাস না রাখলে কোনো ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। ক্বদরে বিশ্বাস রাখা বলতে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল যা কিছু ঘটছে, তার সবই আল্লাহ জানেন এবং এগুলোর পরিণতিও তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"তুমি কি জান না, যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে, এসব কিছুই আল্লাহ জানেন। এগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ।" (সূরা আল হজ : ৭০)

রাসূল ﷺ ক্বদর ইস্যুটি নিয়ে কোনো ধরনের তর্কে জড়াতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, "যখন আমরা ক্বদর নিয়ে তর্ক করতাম কেবল তখনই রাসূলকে ﷺ উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পেতাম। তিনি রেগে যেতেন। তার মুখ লাল বর্ণ ধারণ করত এবং তিনি বলতেন, তোমাদের কী এ বিষয় নিয়ে তর্ক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে? এজন্যই কী আমি তোমাদের কাছে এসেছিলাম? মনে রেখ তোমাদের আগে আরও অনেক জাতি এ ক্বদর নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়েই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই আমি তোমাদের বলছি, ভুলেও ক্বদরের বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হয়ো না।" (তিরমিযি)

ক্বদর নিয়ে আলোচনা করা কিংবা এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে তা মূলত আমাদের গোলক ধাঁধায় ফেলে দেয়- যা থেকে আর সহজে বের হওয়া যায় না। এ কারণে, যদি সতর্কতার সঙ্গে সব সময় উত্তম কাজ করে যাই এবং যা করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা করতে সচেষ্ট হই। তবে শয়তানের ওয়াসওয়াসা আমাদের কখনোই প্রভাবিত করতে পারবে না। আল্লাহ আমাদের মেধা দিয়েছেন, ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা

দিয়েছেন। আমাদের কাছে রাসূলকে ﷺ পাঠিয়েছেন, হেদায়েতের জন্য পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনও পাঠিয়েছেন। সে কারণেই হেদায়েতের ওপর অটল থেকে ভালো কাজ করা আমাদের জন্য অসাধ্য কিছু নয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى
اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আন নিসা : ১৬৫)

রাসূল ﷺ একদিন সাহাবিদের বললেন,"প্রতিটি মানুষের জন্য বেহেশত ও দোযখ উভয় স্থানেই জায়গা নির্ধারিত রয়েছে। তখন সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমাদের কি উচিত নয়, যা নির্ধারিত হয়ে আছে তার ওপর নির্ভর করে সব কাজ ছেড়ে দেয়া। রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, তোমরা ভালো কাজগুলো করে যাও, নেক আমলগুলো অব্যাহত রাখ। তাহলে এ আমলগুলোই তোমাদের নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।" তারপর তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন,

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

"নিশ্চয়ই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। অতএব, যে দান করে, খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।" (সূরা আল লাইল : ৪-১০)

এভাবে রাসূল ﷺ সব সময় সাহাবিদের উত্তম কাজ করার পরামর্শ দিতেন এবং পূর্বনির্ধারিত ফায়সালার ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করে বসে থাকতে নিরুৎসাহিত করতেন।

যাদের জন্য জান্নাত নির্ধারণ হয়ে আছে তারা সেখানে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী কাজ করবে এবং যাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে আছে তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সেই অনুযায়ী খারাপ আমল করবে।

আর আমল বা কাজের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষ জানে আল্লাহ তাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ থেকে পছন্দমতো বাছাই করার ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছে করলে এই ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ভালো কাজ করতে পারে আবার নাও পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; একজন মানুষ চাইলে ঘুরতে যেতে পারে, আবার ঘরেও বসে থাকতে পারে। কিংবা এভাবেও বলা যায়, মানুষ যখন আগুন দেখে তখন সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, আবার ভালো লাগার মতো কিছু দেখলে জলদি ছুটে আসে। মানুষ এভাবেই নিজের পছন্দমত আনুগত্য ও আনুগত্যহীনতার পথ বেছে নিতে পারে।

যুব সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলে দেখা যায়, তারা ক্বদর ইস্যুতে মৌলিকভাবে দুটো বিষয় নিয়ে সংশয়ে থাকে। এই দুটো বিষয় নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

প্রশ্ন-১ : মানুষ যদি ইচ্ছেমতো এবং কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি ছাড়াই কাজ সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে আমরা কীভাবে বলব, সবকিছুই আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত?

উত্তর : কোনো ব্যক্তির কার্যক্রম বা প্রচেষ্টা মূলত দুটি কারণে হয়। একটি হলো স্বাধীন ইচ্ছা আর অপরটি সক্ষমতা। কোনো কাজই এই দুটো ফ্যাক্টর ছাড়া সংগঠিত হয় না। চিন্তা বা পছন্দ করার ক্ষমতা ও সক্ষমতা এ দুটো বিষয় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ইচ্ছাশক্তি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি আর সক্ষমতা হল শারীরিক শক্তি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তিনি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা নাও দিতে পারতেন। তখন মানুষের অবস্থা অন্য পশুদের মতো হতো, যাদের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নেই। অথবা আল্লাহ মানুষকে কাজ করার সামর্থ্য নাও দিতে পারতেন, সেক্ষেত্রে মানুষ যা করতে চাইত তা করার মতো ক্ষমতা থাকত না।

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, তখন আমাদের এ কথা মেনে নিতে হবে, আল্লাহ তায়ালা এই কাজটি এভাবেই সংগঠিত করার ফায়সালা করে রেখেছিলেন। যদি তা না হতো তাহলে ব্যক্তির মনোযোগ সেই কাজ থেকে অন্য কোথাও সরে যেত বা আল্লাহ হয়তো এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন, যার ফলে কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব হতো না।

একবার এক বেদুইনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি আল্লাহর ক্ষমতাকে কীভাবে অনুধাবন করো? সে জবাব দিয়েছিল, "আল্লাহ তায়ালা যেভাবে মানুষের সিদ্ধান্তকে ভেঙে চুরে চুরমার করে দেন এবং তার মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নেন (তাকে অন্য কোনোভাবে ব্যস্ত করে রাখেন) তা দেখে আমি আমার রবের ক্ষমতা বুঝতে পারি।"

প্রশ্ন-২ : বলা হয়ে থাকে, মানুষকে তার নাফরমানি ও আনুগত্যহীনতার জন্য শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু সবকিছু যদি আল্লাহ আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখেন, আর সেখান থেকে যদি বের হওয়ার পথ না থাকে, তাহলে মানুষকে কী করে আনুগত্যহীনতার জন্য শাস্তি দেয়া যায় বা এই দায় কী আদৌ মানুষের ওপর বর্তায়?

উত্তর : কেউ যদি আনুগত্য না করে বা নাফরমানের মতো আচরণ করে, তাহলে তার জন্য ক্বদর বা তাকদিরকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো বাস্তবসম্মত নয়। কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের অজুহাতকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ

"এখন মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা শিরক করা থেকে বিরত থাকতে পারতাম। আমাদের পূর্বপুরুষ এবং আমরাও হারাম থেকে দূরে থাকতাম। মূলত, ঠিক এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা অভিযোগ করেছে ফলে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন,

তোমাদের কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে যা আমাদের দেখাতে পার? তোমরা শুধু আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল।" (সূরা আল আনআম : ১৪৮)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন, তারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করার জন্য তাকদিরকে দায়ী করে অথবা পূর্বপুরুষদের ঘাড়ে দায় চাপায়। অথচ সেই পূর্বপুরুষরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব না আসা পর্যন্ত পথভ্রষ্টই ছিল। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ﷺ আদেশ করেছেন, যাতে তিনি ঐ মিথ্যাবাদীদের চ্যালেঞ্জ করেন। আল্লাহ প্রকাশ্যে এই ভাষায় চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, যদি তাদের দাবির স্বপক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ থাকে তাহলে তা যেনো সামনে নিয়ে আসে। মূলত, এভাবে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে রাব্বুল আলামিন উক্ত মিথ্যাবাদীদের সকল অজুহাত বাতিল করে দিয়েছেন।

ক্বদর হলো অস্বাভাবিক গোপন একটি বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে কেউ যদি নিজ থেকে পাপের পথে অগ্রসর না হয়, তাহলে সে কীভাবে জানবে, আল্লাহ তার জন্য পাপের রাস্তাই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন? কিংবা সেই ব্যক্তি কীভাবে জানবে, আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যতে তার জন্য আদৌ হেদায়েতের পথ রেখেছিলেন কি না? যদি এসব গোমরাহ ব্যক্তিরা এরকমই দাবি করে, তবে তারা কেন নাফরমানির কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসে না ? তাহলে হয়তো বুঝতে পারত, তার জন্য আল্লাহ ভালো পথটিই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন!

আল্লাহ মানুষকে দুটি নেয়ামত দান করেছেন। একটি হলো বিবেচনাবোধ আর অপরটি উপলব্ধি করার ক্ষমতা। আল্লাহ মানুষের কাছে আসমানি গ্রন্থসমূহ এবং নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষের সামনে ভালো ও মন্দের পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন। তারপর তিনি মানুষকে মুক্ত চিন্তা ও কাজ করার সক্ষমতা দিয়েছেন। যাতে মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। তাহলে একজন পাপী বান্দা কেন বারবার ভালো পথ ছেড়ে খারাপ পথে যাওয়ার রাস্তাই বেছে নেয়?

যদি কোনো পাপী ব্যক্তি কোনো দেশে বেড়াতে যেতে চায়, তখন তার সামনে দুটো রাস্তা থাকে, যার একটি হলো সহজ ও নিরাপদ আর অপরটি কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাহলে সে নিজের জন্য সহজ ও নিরাপদ পথটিই বেছে

নিবে। তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন, এই অজুহাত দিয়ে সে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ পথটি বাছাই করবে না। যদি কেউ এমন করেও, তখন তাকে বোকা ও গাধা ছাড়া আর কি ই বা বলা যাবে।

ঠিক একইভাবে, যদি ক্বদরের প্রশ্ন আসে তাহলে ভালো ও মন্দ পথ- উভয় পথ সামনে রেখেই বিবেচনা করতে হবে। সেখানে একজন ব্যক্তি যদি ভালো পথে না গিয়ে খারাপ পথে যায় এবং সে জন্য যদি পূর্বনির্ধারিত ফায়সালাকে দায়ী করে, তাহলে প্রকৃত অর্থে সে নিজের সাথেই প্রতারণা করল।

অধিকন্তু, বাস্তব জীবনে দেখা যায়, একজন সামর্থ্যবান ও সক্ষম মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাই কাজে লাগায়। জীবিকার আশায় কখনোই ঘরে অলসভাবে, নিরাপদে বসে থাকে না, কাজও ছেড়ে দেয় না এবং তাকদিরকে নিজের জীবন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায় না। মজার ব্যাপার হলো, দুনিয়ার জীবনে তাকদিরকে অজুহাত হিসেবে উপস্থাপন না করলেও, আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তারা ঠিকই অজুহাত হিসেবে সামনে নিয়ে আসে। অর্থাৎ কেবল আল্লাহর নাফরমানি করার ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভাগ্যকে দোষারোপ করে! কিন্তু পার্থিব ফায়দা হাসিল করার ক্ষেত্রে তা কেউই করতে চায় না।

এই বিষয়টি মূলত খুবই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। তবে প্রকৃত সত্য হলো, কল্পনা আর দুনিয়াবি কামনা-বাসনার কাছে কাবু হয়ে মানুষ অন্ধ হয়ে যায় এবং নানা ধরনের অজুহাত তুলে সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায়।

যুবক ও যৌবন সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস

বর্তমানে যুব সম্প্রদায় যেসব সমস্যা, সংকট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে, প্রথম চারটি অধ্যায়ে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পর্যায়ে আমরা, বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করছি, যা প্রিয়নবী ﷺ যুবক ও যৌবন প্রসংগে উল্লেখ করে গেছেন।

১. আবু আব্বাস আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাবো- আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে সম্মুখেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তা আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, আর আল্লাহ্ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সকল মানুষ মিলে তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায়, আর আল্লাহ্ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা ব্যতীত আর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাও শুকিয়ে গেছে।" (তিরমিযি : ২৫১৬)

২. উকবাহ বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা সেই যুবকের প্রতি বিস্মিত হন, যার যৌবনে কোনো কুপবৃত্তি ও ভ্রষ্টতা নেই।" (আহমাদ ১৭৩৭১, ত্বাবারানি ১৪২৬৯, সিলসিলাহ সহিহাহ ২৮৪৩ নং)

৩. জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, "আমরা নবী ﷺ এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী ও সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (ইবনে মাজাহ : ৬১)

৪. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হাসান ও হুসাইন জান্নাতি যুবকদের নেতা এবং তাদের পিতা তাদের চেয়ে

শ্রেষ্ঠ।" (ইবনে মাজাহ, ১১৬, তাখরীজ আলবানি : সহিহ ৯৭৯)

৫. আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন সাত শ্রেণির মানুষকে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন- যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তারা হলেন (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকে (৩) যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে (৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্যই পৃথক হয় (৫) ঐ ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী উচ্চ বংশীয় ভদ্র মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলে, আমি আল্লাহর আজাবকে ভয় করি (৬) যে ব্যক্তি গোপনে সদাক্বাহ করে। এমনকি তার বাম হাত জানে না ডান হাত কি খরচ করছে (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর স্মরণকালে তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। (হাদীস : বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযি ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ ৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭)

৬. আবু সুলায়মান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা কয়েকজন নবী ﷺ এর কাছে হাজির হলাম। আমরা ছিলাম সমবয়স্ক যুবক। আমরা একাধারে বিশ রাত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। তিনি অনুভব করলেন, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বাড়িতে কাকে কাকে রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বাস্তবিকই অত্যন্ত সদয় ও দয়াশীল ছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদের দ্বীনের জ্ঞান দান কর এবং ভালো কাজ করার নির্দেশ দাও। আর তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছ ঠিক সেভাবেই নামাজ পড়। নামাজের ওয়াক্ত হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নামাজে ইমামতি করবে।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আদাবুল মুফরাদ : ২১২)

৭. আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দুটি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। একটি হল দুনিয়ার মুহাব্বত, অপরটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। (বুখারী পর্ব ৮১ :/৫,৬৪২০, মুসলিম ১২/৩৮,১০৪৬)

৮. আনাস ইবনু হাকীম আদ্-দাব্বী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তিনি যিয়াদ অথবা ইবনু যিয়াদের ভয়ে মদিনায় চলে আসেন এবং আবু হুরায়রাহর (রা) সাথে সাক্ষাৎ করেন। আবু হুরায়রাহ (রা) আমাকে তাঁর বংশ পরিচয় দিলেন এবং আমিও আমার বংশ পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে বলেন, হে যুবক! আমি কি তোমার কাছে হাদীস বর্ণনা করব না? জবাবে বললাম হ্যাঁ, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন!" বর্ণনাকারী ইউনুস বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এ হাদীস সরাসরি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেন, "ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাত সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আমাদের মহান রব ফেরেশতাদের বান্দার সালাত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন, দেখ তো সে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছে, নাকি কোনো ত্রুটি রয়েছে? অতঃপর বান্দার সালাত পূর্ণাঙ্গ হলে পূর্ণাঙ্গই লিখা হবে। আর যদি ত্রুটি থাকে তাহলে মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, দেখ তো আমার বান্দার কোনো নফল সালাত আছে কি না? যদি থাকে তাহলে তিনি বলবেন, আমার বান্দার ফরয সালাতের ঘাটতি তার নফল সালাত দ্বারা পরিপূর্ণ কর। অতঃপর সব আমলই এভাবে গ্রহণ করা হবে (অর্থাৎ নফল দ্বারা ফরযের ত্রুটি দূর করা হবে)।" (আবু দাউদ ৮৬৪)

৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক যুবকের নিকট গেলেন। তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন, "তোমার কেমন অনুভব হচ্ছে? যুবকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের আশা করছি, কিন্তু আমার গুনাহর কারণে ভয়ও পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে বান্দার হৃদয়ে এমন সময়েও এরূপ দুই বিপরীত জিনিস একত্র হয়, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস দান করেন এবং বিপদাশঙ্কা থেকে নিরাপদ রাখেন।" (তিরমিযি ৯৮৩, ইবনু মাজাহ (৪২৬১)।

১০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কোনো এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। বিয়ের খরচ বহনের মতো আমাদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। তিনি বললেন, হে যুব সমাজ। তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ তার যৌনশক্তিকে এই রোজাই নিয়ন্ত্রণে রাখবে।" (তিরমিযি ১০৮১, ইবনুল মাজাহ (১৮৪৫), বুখারী, মুসলিম)

১১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, "আসলাম গোত্রের এক যুবক এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদ করতে চাচ্ছি; কিন্তু তার জন্য আমার কোনো সাজ-সরঞ্জাম নেই।' তিনি বললেন, "তুমি অমুকের নিকট যাও। কারণ সে (যুদ্ধের জন্য) সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু (ভাগ্যক্রমে) সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।" সুতরাং সে তার কাছে এসে বলল, 'রাসূল ﷺ তোমাকে সালাম পেশ করেছেন এবং বলেছেন, তুমি আমাকে ঐসব সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যা তুমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছিলে।' এই কথা শুনেই সেই অসুস্থ যুবক নিজের স্ত্রীকে বলল, ওকে ঐ সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যেগুলো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছিলাম। আর ওর মধ্য থেকে কোনো কিছু রেখে দিও না, বরং সব কিছুই দিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! তুমি তার মধ্য হতে কোনো জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।' (মুসলিম ১৮৯৪, আবু দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১২৭৪৮)

১২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি যুবক নবী ﷺ এর খিদমাত করতেন। তাঁর মৃত্যুশয্যায় নবীজি ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার পাশে বসে বললেন, "হে অমুক! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। যুবকটি তার পাশে থাকা পিতার দিকে তাকাল। পিতা তাকে বলল, আবুল কাসিমের কথা মেনে নাও। তারপর যুবকটি ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর রাসূল ﷺ তার কাছ থেকে বের হয়ে এসে বললেন, "আল্লাহর শুকরিয়া। আমি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।" (সহিহ : বুখারীর ১৩৫৬, নাসাঈ ৩০৯৫, আহমাদ

১৩৯৭৭, ইবনু হিব্বান ৪৮৮৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি ১২১৫৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৫৭, ইরওয়া ১২৭২)

১৩. আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের এ লোকগুলো (যুবকগণ) মানুষের ধ্বংস ডেকে আনবে। সাহাবিগণ বললেন, তখন আপনি আমাদের কী করতে বলেন? তিনি বললেন, মানুষেরা যদি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করত তবে ভালোই হতো।" (বুখারী পর্ব ৬১ অধ্যায় ২৫ হাদীস নং ৩৬০৪)

১৪. মু'আয ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে প্রবেশের সময় জান্নাতিদের শরীরে লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক।" (তিরমিযি : জান্নাতের বিবরণ : হাদীস নং ২৫৪৫)

১৫. আবু সা'ঈদ ও আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, এখন থেকে তোমরা জীবিত থাকবে, আর কখনো মরবে না। তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা অফুরন্ত ভোগবিলাসের ভিতর থাকবে, অভাব-অনটন কখনো তোমাদের স্পর্শ করবে না। এটাই আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য "তোমরা পার্থিব জীবনে যেসব কাজ করেছ তার বিনিময়ে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হলে।" (সূরা যুখরুফ ৭২)। (সহিহ মুসলিম ৮/১৪৮)

১৬. আলি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে বিচারক হিসেবে প্রেরণ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক হিসেবে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন নব যুবক; বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন এবং তোমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার সামনে বাদী-বিবাদী বসবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনবে অনুরূপভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিবে না। এতে তোমার সামনে মোকদ্দমার আসল সত্য প্রকাশিত হবে। আলি (রা) বলেন, অতঃপর

আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো ধরনের সন্দেহের মধ্যে পড়িনি।" (আবূ দাউদ, ৩৫৮২)

১৭. মুআ'য বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে বান্দার পাদুটো নড়বে না যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় (১) তার বয়স সম্পর্কে, কীভাবে তা সে খরচ করেছে। (২) তার যৌবন সম্পর্কে কীভাবে তা পুরাতন করেছে। (৩) তার সম্পদ সম্পর্কে কীভাবে তা উপার্জন করেছে এবং কোন পথে খরচ করেছে। (৪) আর তার বিদ্যা সম্পর্কে তা দ্বারা কি আমল করেছে?" (সহিহ তারগিব ওয়াত তাহরিব ইলম বা বিদ্যা অধ্যায় ১২৭)

১৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনিমত জেনে মূল্যায়ন কর; বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মরণের পূর্বে জীবনকে।" (হকেম ৭৮৪৬, বাইহাকির শুআবুল ঈমান ১০২৪৮, সহিহুল জামে' ১০৭৭নং)

১৯. আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে সে স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। তার পরিধেয় বস্ত্র কখনো পুরনো হবে না এবং তার যৌবন কখনো শেষ হবে না।" (ই.ফা. ৬৮৯৩, ই.সে. ৬৯৫০)

এই হাদীসগুলো যেন আমরা সঠিকভাবে ধারণ ও অনুশীলন করতে পারি, আল্লাহ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় তথা যৌবনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার তাওফিক দিন। আমিন।

যষ্ঠ অধ্যায়

জিহাদ নিয়ে অপব্যাখ্যা

জিহাদ আরবি শব্দ। কিন্তু এই শব্দটি যখন ইংরেজি করা হয়, তখন লেখা হয় হলি ওয়্যার বা পবিত্র যুদ্ধ। অথচ ইসলামের মৌলিক উৎস এবং প্রাথমিক যুগের ইসলামি সাহিত্যের কোথাও যুদ্ধকে পবিত্র হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়নি। ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ বলতে এক গুচ্ছ কার্যক্রমকে বোঝানো হয়, যেখানে মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে অন্যায্য কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ, নিজের সাথে বোঝাপড়া, কিংবা পরিবারের চাহিদা পূরণ পর্যন্ত সব কিছুই রয়েছে। মৌলিকভাবে জিহাদ শব্দটি দিয়ে আল্লাহর পথে চেষ্টা ও সংগ্রাম করাকে বোঝানো হয়। এ কারণে জিহাদ কেবল যুদ্ধের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং একজন মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের আত্মা, বচন, দেহ ও সম্পদ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে রাখার জন্য এবং সেই নির্দেশনার আলোকে সার্বিকভাবে গোটা জীবন পরিচালিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালায়, তা-ই জিহাদ।

ইসলামি চিন্তাবিদরা জিহাদের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যেমন :

- ব্যক্তির নিজের সাথে জিহাদ (যাতে ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয়, সেই আলোকে কাজ করা যায়, অন্যকে ইসলামের পথে আহ্বান করা যায় এবং সেই আহ্বান করতে গিয়ে যে সমস্যাগুলো তৈরি হবে, তা মোকাবেলা করা এর অন্তর্গত)।

- শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ (শয়তানের নানা গুঞ্জন, প্ররোচণা, সংশয়-সন্দেহ এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হয়)।

- জিহ্বার বিরুদ্ধে জিহাদ (জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা, তা ভালো কাজে ব্যবহার করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো, ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া এবং মনগড়া মানব রচিত মতবাদগুলোর উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য জিহ্বাকে ব্যবহার করা) এবং

- আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ (যাতে মুসলিমদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান হেফাজত করা যায়)।

- এছাড়া আরও কয়েক ধরনের জিহাদ রয়েছে। যেমন : মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ, জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং যারা অন্যায় ও অনাচার করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

যদি জিহাদ শব্দটি দিয়ে যুদ্ধ বোঝানো হয়, তবে সেক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত ও নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। প্রথম নিয়মটি হলো, কেবল ভিন্ন বিশ্বাস রাখার কারণে অথবা ইসলাম গ্রহণে অনীহা থাকার কারণে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।

দ্বিতীয় নিয়ম, কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যাবে, যারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে। কিন্তু অযাচিতভাবে কাউকে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

"আর লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্যই কারও প্রতি বাড়াবাড়ি কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল বাকারা : ১৯০)

অর্থাৎ মুসলিমরা কেবল আরোপিত আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারবে, নিজেরা যুদ্ধ শুরু করতে পারবে না। আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই বলতে একদিকে যেমন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই বোঝানো হয়, একইভাবে আগ্রাসনের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলাও এর আওতাভূক্ত। মুসলিমদের উভয় ক্ষেত্রেই প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের জাতিসত্তাকে রক্ষা করতে পারে এবং যেকোনো সামরিক সংঘাত মোকাবেলা করতে পারে। এসব ছাড়াও যুদ্ধে জড়ানোর ক্ষেত্রে আরও কিছু শর্ত রয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত শর্ত দুটি প্রায়োগিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ব্যাপকতাও অনেক বেশি।

আরও একটি শর্ত হলো, জিহাদ কেবল ইসলামি নেতৃত্বের জিম্মাদারিতেই সংগঠিত হতে হবে। কারণ উপযুক্ত ইসলামিক নেতৃত্বই জিহাদ করার মতো উপযুক্ত প্লাটফর্ম ও প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করতে পারে। যে কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ

হঠাৎ নিজের মতো করে মনগড়া কিছু তথ্য বানিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। বরং মুসলমানদের সুনির্দিষ্ট নেতা বা ইমামের আওতায় জিহাদে অংশ নিতে হবে। তবে কাউকে যদি নিজস্ব পরিবার, নিজের সম্পদ কিংবা প্রতিবেশীকে রক্ষা করার জন্য এককভাবে সাময়িক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে এ ধরনের নির্দেশনাও পাওয়া যায়।

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

"আর যখন তাদের কাছে শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের কোনো সংবাদ পৌঁছে, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তাহলে যদি আদৌ সংবাদগুলোতে অনুসন্ধান করার মতো কিছু থাকত, তাহলে তা অনুসন্ধানও করা যেত। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের ওপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ছাড়া সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করতো!" (সূরা আন নিসা : আয়াত ৮৩)

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) একবার রাসূলকে ﷺ প্রশ্ন করলেন, আখেরি জমানায় যদি মুসলিমদের একক কোনো নেতৃত্ব না থাকে কিংবা অনেকগুলো দল বা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন কী হবে? রাসূল ﷺ বলেন, "তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা সৃষ্টি হবে। আর সেই সময় ভ্রান্ত 'আক্বিদাহ-বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে জাহান্নামের আগুনের দিকে একদল লোক আহ্বান করবে। হে হুযাইফা! তখন তুমি যদি বৃক্ষমূলও আঁকড়ে ধরে মরে যেতে পারো, তাদের অনুসরণ করার চাইতে বরং মৃত্যুই উত্তম হবে।" (সহীহ আল বুখারী, সুনানে আবু দাউদ, ৪২৪৬)

জিহাদের জন্য আরও কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন একটি সাধারণ শর্ত হলো, জিহাদ তখনই করা যাবে যখন আইনগত দিক থেকে যুদ্ধ করার মতো প্রয়োজনীয়তা বা আবশ্যকতা দেখা দেবে; কিংবা যেখানে নিয়ম ভাঙ্গার জন্য যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রেও কুরআনের কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ "আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা কর না।" (সূরা নিসা : ২৯)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً "কোনো মুসলমানের দুর্ঘটনা ছাড়া অপর কোনো মুসলমানকে হত্যা করা উচিত নয়।" (সূরা নিসা : ৯২)

এছাড়া ইসলাম পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছে, যুদ্ধ করতে হলেও ন্যূনতম কিছু বিধান অবশ্যই মানতে হবে। যেমন :

- কোনো অবস্থাতেই নারী, শিশু ও বয়স্কদের এবং সেই সাথে যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদের হত্যা করা যাবে না।
- নারী, শিশু ও বয়স্কদের ক্ষতি করা যাবে না।
- ভূমি ও ফসল নষ্ট করা যাবে না।
- গাছ কাটা যাবে না।
- ফসলি জমি বিনষ্ট করা যাবে না।
- অমুসলিমদের ওপর জোর করে ইসলাম চাপিয়ে দেয়া যাবে না।
- এমনকি যুদ্ধরত অমুসলিমরা নিজেদের অবস্থা বেগতিক দেখে কৌশল হিসেবে যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তারপরও সেই সুযোগ দিতে হবে এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।
- হত্যা না করে বরং শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। চুক্তি ও সমঝোতার পথ অনুসরণ করতে হবে।
- যদি শত্রুপক্ষের কোনো যুদ্ধবন্দি ধরা পড়ে, তবে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

"আর লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল বাকারা : ১৯০)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারও প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)।" (সূরা আল বাকারা : ১৯৩)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, আল্লাহ তোমাদের তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম। (সূরা আল মুমতাহিনা : ৮-৯)

মুসলিম জাতিগোষ্ঠীকে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়, কোনো অপশক্তি যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে তার মোকাবেলা করা যায় এবং সবধরনের আগ্রাসনের প্রতিকার করা যায়।

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। নিজের শক্তি, সামর্থ্য এবং পালিত ঘোড়াকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা কর। যাতে, তোমরা আল্লাহর ও তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলা করতে পার। সেই সাথে তাদেরকেও, যাদের সম্বন্ধে তোমরা ভালোমতো জানো না, কিন্তু আল্লাহ তাদের সবটাই জানেন। বস্তুতঃ তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরোটাই তোমরা ফেরত পাবে। তোমাদের কোনো হক অপূর্ণও থাকবে না।" (সূরা আনফাল : আয়াত ৬০)

সপ্তম অধ্যায়

ক্রীতদাস প্রথা

ইসলাম আগমনের বহু পূর্ব থেকেই সমাজে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। তাই বাস্তবতার নিরিখে ইসলামে ক্রীতদাস প্রথাকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করা হয়নি। তবে এর ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সেইসাথে ক্রীতদাস মুক্ত করাকে বিরাট পুণ্যের কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

ইসলামে কেবল একটি কারণেই ক্রীতদাস রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাহলো, যদি কোনো মুসলিম দেশ কোনো অমুসলিম দেশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে যুদ্ধশেষে যে অমুসলিম নাগরিকরা যুদ্ধবন্দি হিসেবে ধরা পড়বে, মুসলিম শাসকরা তাদের ক্রীতদাস বানাতে পারবে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে অথবা মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিতে পারবে। এক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের দেশের ও জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বাইরে আর কোনো উপায়ে ক্রীতদাস বানাতে নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে, কোনো মানুষকে দারিদ্রতা, ঋণ, অপহরণ অথবা অন্য কোনো কারণে ক্রীতদাস বানানো যাবে না। এমনি কোনো মানুষ স্বেচ্ছায়ও ক্রীতদাস হতে পারবে না।

ইসলাম ক্রীতদাস মুক্ত করার বিষয়টি সবসময় উৎসাহ দেয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন গুরুতর পাপের দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্রীতদাস মুক্তি করার সুপারিশ করা হয়েছে। যেমনঃ দুর্ঘটনাবশত মানুষ হত্যা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা সহবাসের কারণে রোজা ভাঙার মতো পাপ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য, ক্রীতদাস মুক্তি দেয়াকে বিকল্প সমাধান হিসেবে রাখা হয়েছে। শরিয়াতে যে ৮টি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ক্রীতদাস মুক্তিকে একটি নেক আমল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে; তা যেকোনো সময় পালন করা যায়।

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা ওয়াদা পালন করে এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী। তারাই হল সত্যাশ্রয়ী আর তারাই পরহেযগার ও মুত্তাকি।" (সূরা আল বাকারা : ১৭৭)

ক্রীতদাসদের সাথে সদাচরণ প্রসঙ্গে রাসূলের ﷺ বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। যেমন:

আবু মুসা আল আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন লোকের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। প্রথমত যে আহলে কিতাব নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছে আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতিও ঈমান এনেছে। দ্বিতীয়ত, যে ক্রীতদাস যথানিয়মে আল্লাহর হক আদায় করেছে এবং একই সাথে নিজের মুনিবেরও হক আদায় করেছে। তৃতীয়ত, যার তত্ত্বাবধানে ক্রীতদাসী ছিল, আর সে তাকে উত্তম আদব শিখিয়েছে এবং উত্তমরূপে ইলম শিক্ষা দিয়েছে। অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেছে, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।" (তথ্যসূত্র : বুখারী ৯৭, মুসলিম ১৫৪, নাসায়ী ৩৩৪৪, তিরমিযি ১১১৬, দারিমি ২২৯০, সহিহ আল জামি' ৩০৭৩, সহিহ আত্ তারগিব ১৮৮২।)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ক্রীতদাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, "তোমরা যা খাও তাদেরকেও তা-ই খাওয়াও। তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা-ই পরিধান করাও। মহামহিম আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।" (তথ্যসূত্র: আদাবুল মুফরাদ : ১৮৭)

আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আমার দাস, আমার দাসী না বলে। ক্রীতদাসও যেন আমার প্রভু না বলে। সে বলবে, আমার যুবক, আমার যুবতি, আমার নেতা। তোমাদের প্রত্যেকেই দাস, কেবল মহামহিম আল্লাহই হচ্ছেন রব (প্রভু)।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, আদাবুল মুফরাদ ২০৯)।

আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি এক দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দিনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দিনার কোনো মিসকিনকে সদকাহ কর, আর এক দিনার নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এসবের মধ্যে ঐ দিনারের বেশি নেকী রয়েছে, যা তুমি নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবে।" (তথ্যসূত্র : মুসলিম ৯৯৫, আহমাদ ৯৭৬৯, ৯৮১৮)

বারা বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, একবার এক বেদুইন আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, "বক্তব্য ছোট হলেও, বিষয়টি তুমি (স্পষ্ট) পেশ করে ফেলেছ। তুমি ক্রীতদাস স্বাধীন কর। তাতে সক্ষম না হলে ক্ষুধার্তকে অন্ন এবং তৃষ্ণার্তকে পানি দান কর...।" (আহমাদ ১৯৬৪৭, বুখারীর আদব ৬৯, ইবনে হিব্বান ৩৭৪, বাইহাকির শুআবুল ঈমান ৪৩৩৫, সহিহ তারগিব ৯৫১)

আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কেউ কোনো মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করলে আল্লাহ্ সেই ক্রীতদাসের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তার এক একটি অঙ্গ জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করবেন।" (বুখারী পর্ব ৪৯: /১, হাঃ ২৫১৭; মুসলিম ২০/৫, ১৫০৯)

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ইসলামে ক্রীতদাস প্রথাকে যেভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, তা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে বিদ্যমান ক্রীতদাস সংক্রান্ত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ইসলামের সঠিক চেতনা বোঝার এবং সেই আলোকে আমল করার তাওফিক দিন। আমিন।

শেষ কথা

এই বইটিতে আমরা যুব সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সমস্যা এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে এর কিছু সমাধান তুলে ধরেছি। এই বইটিতে যাবতীয় যুব সংকটের সমাধান খোঁজা হয়নি। তবে, একটি নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আশা করি, পাঠকেরা এই বইটিতে প্রদত্ত তথ্যগুলো থেকে উপকার পাবেন। চিন্তার খোরাক পাবেন। একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামে যাপিত জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানই রয়েছে। তবে, অনেকক্ষেত্রেই আমরা প্রায়োগিক কৌশল প্রনয়ণে সফল হতে পারিনি। শায়খ সালিহ আল উসাইমীন নিজে বয়সে প্রবীন হলেও সমাজের যুব প্রজন্মের চলমান অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের পতনের কারণ সম্পর্কে বিস্তর পর্যালোচনা করেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি রচনা করেছেন।

পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং সেক্যুলার চিন্তা দর্শনের ব্যাপক বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে যুব সম্প্রদায়ের সমস্যা সাম্প্রতিককালে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। নামে মুসলমান হলেও অনেক যুবকের জীবনাচরণেই ইসলামের প্রভাব নেই। এমন কি, ইসলামিক ঘরানার বলে পরিচিত- এমন পরিবারগুলোতে থাকা যুবকেরাও নানা সময়ে বিপথগামী হয়ে পড়ছে। অথচ যুবকরা বিপথগামী হলে উম্মাহ'র ভবিষ্যৎও যে অনিশ্চয়তা এবং ভ্রষ্টতার পথে চলে যাবে- তা বলাই বাহুল্য।

শায়খ উসাইমীনের এই বইটি আমাদেরকে এই তাগিদই দেয় যে, আমাদেরকে সমস্যামুক্ত একটি জীবন যাপন নিশ্চিত করার জন্য আবারও ইসলামের কাছেই ফিরতে হবে। ইসলামি সংস্কৃতির অনুশীলন বাড়াতে হবে। সর্বোপরি, কুরআন ও হাদীসের অনুশীলন ও চর্চাকে প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দিন। আমাদের উপর রহম করুন যাতে আমরা নিকটস্থ যুবক-যুবতীদেরও গোমরাহির পথ থেকে ফিরিয়ে এনে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসতে পারি। আমিন।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহঃ) ছিলেন সঊদী আরবের খ্যাতিমান আলেম, ফকীহ, মুফতী ও সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ও আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায-এর সাথে উসাইমীনকেও বিংশ শতকের শেষার্ধের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

তিনি ১৩৪৭ হিজরীর ২৭শে রামাদান মোতাবেক ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক সঊদী আরবের 'আল-কাছীম' প্রদেশের 'উনায়যা' নগরীতে এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে মাত্র ছয় মাসে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। তিনি সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী, বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায এর কাছে ছহীহ বুখারী, ফিকহ ও ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-এর কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পাশাপাশি তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৩৯৮-৯৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষ থেকে আমৃত্যু তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আল-কাছীম' শাখার শরী'আহ অনুষদে পাঠদান করেন। তার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা শতাধিক। *তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসাইল (৪২ খন্ড), আশ-শারহুল মুমতি (১৬ খন্ড), আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (৩ খন্ড) প্রভৃতি।*

শায়খ উসাইমীন (রহঃ) দলীলের আলোকে যে মতটি প্রাধান্যযোগ্য মনে করেছেন সেটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া আমাদের প্রিয়পাত্র। কিন্তু হক তাঁর চেয়ে আমাদের নিকট আরো বেশি প্রিয়'। আজীবন দরস-তাদরীস ও দাওয়াতী কাজে নিবিষ্টচিত্ত এই খ্যাতিমান আলেম ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৪১৪ হিজরী/ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ ফয়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন।

আধুনিক মুসলিম বিশ্বের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ১৪২১ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল মোতাবেক ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে জেদ্দা নগরীতে ইন্তেকাল করেন।